২০১৩ টিআইপি প্রতিবেদন - বাংলাদেশ - দ্বিতীয় পর্যায়

বাংলাদেশ বাধ্যতামূলক শ্রম ও দেহব্যবসার জন্য পাচারকৃত নারী, পুরুষ ও শিশুর উৎস রাষ্ট্র। কিছু বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ, যারা স্বেচ্ছায় মধ্যপ্রাচ্য, মালদ্বীপ, ইরাক, ইরান, লেবানন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, ইউরোপ ও অন্যান্য রাষ্ট্রে কাজ করতে যায় তারা এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হয় যা বাধ্যতামূলক শ্রমের নির্দেশক; যেমন চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা, পাসপোর্ট আটকে রাখা, শক্তি প্রয়োগের হুমকি, শারীরিক বা যৌন নির্যাতন এবং অভিবাসন আইনলঙ্ঘনের জন্য শাস্তি বা উক্ত দেশ হতে বহিষ্কারের হুমকি। বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার আগে অনেক অভিবাসী শ্রমিকই উচ্চ নিয়োগ ফি প্রদান করার লব্ধ্যে ঋণ গ্রহণ করে। এই উচ্চ নিয়োগ ফি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নিয়োগ সংস্থা সংগঠন (বায়রা) দ্বারা আইনসম্মতভাবে কিংবা লাইসেন্সবিহীন সাব-এজেন্ট কর্তৃক বেআইনীভাবে আরোপিত হয়। যার ফলে কিছু অভিবাসী শ্রমিক ঋণশোষনের কবলে পড়ে যায়। কিছু নিয়োগ সংস্থা ও এজেন্টরা চুক্তি পরিবর্তন যেখানে তারা একধরনের কাজের ও পরিবেশের কথা বলে তবে, পরে কাজ, পরিবেশ, নিয়োগকর্তা ও বেতন পরিবর্তন করে দেয়া সহ বিভিন্ন নিয়োগ সংক্রান্ত জালিয়াতিও করে থাকে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বাংলাদেশী নেপালে ট্রানজিট নিয়ে সেখান থেকে নেপালী ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে যাচ্ছে বলেও প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে কিছু পাচারের শিকার। একটি সুশীল সমাজ দল জানায় যে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও কিছু বাংলাদেশী পুরুষ গ্রীস স্পেনসহ অন্যান্য দেশে জোরপূর্বক শ্রমের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ থেকে কিছু নারী ও শিশু ভারত ও পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তারা বাণিজ্যিক যৌন অপব্যবহার বা জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হয়। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্যও মানবপাচারের শিকার হয়েছে।

দেশের মধ্যেও কিছু বাংলাদেশী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কগণ যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য পাচার, গৃহদাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক ও দাসশ্রমের শিকার হয়। এক্ষেত্রে পাচারকারী বা নিয়োগকারী সংস্থা কর্মসংস্থানের চুক্তির অংশ হিসেবে একজন কর্মী কর্তৃক নেয়া ঋণের অপব্যবহার করে। কিছু শিশুদের অপরাধে লিপ্ত হতে বা ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়; ভিরাবৃত্তির হোতাগণ মাঝে মাঝে শিশুদের বিকলাঙ্গ করে দেয় যাতে আরো অধিক অর্থ উপার্জন করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিতামাতাগণ শিশুদের দাসশ্রমের জন্য বিক্রি করে দেয় আবার অন্যান্য শিশুরা জালিয়াতি ও শারীরিক শোষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শ্রম বা যৌন অপব্যবহারের শিকার হয়। ঋণ বাধ্যকতার ওপর একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের মতে কিছু বাংলাদেশী পরিবার ও কিছু ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিক বাংলাদেশের ইঁটের ভাটায় দাসশ্রমের শিকার হয়। কিছু ইঁটের ভাটার মালিক ঋণে আবদ্ধ নারীদের পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি করে দেয় যাতে পরিবারের নেয়া ঋণ পরিশোধ করা যায়। সেই বিশেষজ্ঞ আরো বলেন যে কিছু বাংলাদেশী পরিবার বাংলাদেশের দৰিণপূর্ব অঞ্চলে চিংড়ি চাষখাতে ঋণ দাসশ্রমের শিকার হয় এবং কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারকে দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে চা খাতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়েরাও এদেশে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির শিকার হয় যেখানে তারা দাসত্বের পরিস্থিতিতে একাকী পরিবেশে জীবনযাপন করে। পাচারবৃত্তি প্রায়ই দরিদ্র, পল্লী এলাকা থেকে শহরে সংঘটিত হয়। অনেক পতিতালয়ের মালিক ও দালালরা মেয়েদের উত্তেজক ওষুধ (স্টেরয়েড) গ্রহণে বাধ্য করে যাতে তারা খদ্দেরের নিকট আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক।

বাংলাদেশ পাচার নির্মূল করার জন্য সর্বনিম্ন মানদন্ড পুরোপুরি মেনে চলে না। তবে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রটি উলেখ্যযোগ্য অগ্রগতি সাধন করছে। সরকার ২০১২ মানব পাচার রোধ ও প্রশমন আইন (এইচটিডিএসএ) বাস্তবায়নের জন্য নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেছে এবং এই আইনের আওতায় বিভিন্ন মামলার বিচার শুরু করেছে। তবে, আইন প্রণয়নে সুষ্ঠু প্রচেষ্টার অভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা বিদেশে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের পাচারে অবদান রেখে চলেছে। সরকার জাল নিয়োগকারী সংস্থা ও তাদের লাইসেন্সবিহীন সাব-এজেন্টদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে সীমিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাচারের শিকার ব্যক্তিদের অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে এখনো বিদ্যমান।

বাংলাদেশের জন্য পরামর্শ: এইচটিডিএসএ বাস্তবায়নের নিয়মাবলী চূড়ান্ত, গ্রহণ ও বিতরণ করা এবং এর বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিৰণ প্রদান। লাইসেন্সধারী শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দাবিকৃত নিয়োগ ফি সিংহভাগ হ্রাস করা এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে অপরাধী অভিযোগ প্রণয়ন করা; পাচার সংক্রান্ত মামলার বিচার করার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার আওতায় পাচার সংশিষ্ট অপরাধীদের বিচার করা; জাল শ্রমিক নিয়োগসংস্থাদের বিচার করতে এইচটিডিএসএ ব্যবহার করা; দাসশ্রমের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু সংক্রান্ত মামলাসহ সক্রিয়ভাবে পাচার সংক্রান্ত মামলা চিহ্নিত করার পন্থার ওপর আইন প্রণয়নকারী কর্মকর্তা, শ্রম ইন্সপেক্টর ও অভিবাস কর্মকর্তাসহ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা; পাচার সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সংশিষ্টতা নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে সেগুলোর মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ নেয়া বিশেষ করে অপরাধমূলক বিচারের মাধ্যমে; বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নিয়োগকারী সংস্থাগুলো শ্রম পাচারে অবদানকারী কোনো চর্চায় লিপ্ত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে তাদের ওপর নজরদারির উন্নয়ন করা; পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও জোরপূর্বক শ্রমের শিকারদের সহযোগিতামূলক সেবা প্রদান; সরকারী কর্মকর্তা, কর্মী ও হুমকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর প্রতি দাসশ্রমের বিরবদ্ধে বিদ্যমান আইন সম্বন্ধে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো; পাচার হয় এমন রাষ্ট্রগুলোর বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে আশ্রয়, আইনী সহায়তা, উপদেশ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সেবার মান উন্নয়ন; বাংলাদেশী পাচারের শিকার ব্যক্তিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য বাংলাদেশী দূতাবাসগুলো থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণের সময় হ্রাস করা; সম্ভাব্য অভিবাসীদের অভিবাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাদের নিকট অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি করা; শ্রম অধিকার, শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ ও লক্ষ্য রাষ্ট্রগুলোতে সহায়তা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার পন্থাসহ দেশ ত্যাগের পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন; বাংলাদেশে ও বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে চিহ্নিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন; মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়া সম্ভব একটি শ্রম অপব্যবহার বিষয়ক টোলবিহীন হটলাইন প্রতিষ্ঠা করা যাতে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সহজ হয়; এবং জাতিসংঘ মানবপাচার প্রটোকল ২০০০-এর প্রতি সম্মত হওয়া।

মামলা পরিচালনা

প্রতিবেদন সময়কালীন বাংলাদেশ সরকার পাচার-বিরোধী আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ২০১২ সালের 'এইচটিডিএসএ' অনুযায়ী সাধারণত যে কোন প্রকারের মানব পাচার নিষিদ্ধ ও শাস্তির বিধান রয়েছে, যদিও এটি জোরপূর্বক শ্রম সম্পর্কে নিয়োগকারী অবহিত ছিল কী না তার প্রমাণের অভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতারণামূলক

নিয়োগ নিষিদ্ধ করেনি ।শ্রমিক পাচার আপরাধের জন্য শাস্তির বিধান আছে পাঁচ থেকে ১২ বছরের কারাবাস এবং ৬০০ ডলারের মত জরিমানা, এবং যৌন পাচার অপরাধে শাস্তির বিধান রয়েছে পাঁচ বছরের কারাবাস থেকে মৃত্যুদন্ড। এই শাস্তির বিধান অন্যান্য ভয়ানক অপরাধের শাস্তি যেমন ধর্ষণ-এর মতই কঠোর ও সমপর্যায়ের। প্রতিবেদন চলাকালীন সরকার 'এইচটিডিএসএ'র খসড়া তৈরী করেছে তবে এর বাস্তবায়নে কোন বিধি এখনো প্রণয়ন করেনি। নতুন আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের কিছু বিধি বাতিল করা হয়েছে, যা নিষিদ্ধ করেছে বাণিজ্যিক যৌনতার উদ্দেশ্যে বা অনৈচ্ছিক দাসত্বের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার; তবে এ সমস্ত বিধির আওতায় মামলা রয়েছে তা 'এইচটিডিএসএ' আইনে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে এবং 'এইচটিডিএসএ'র এখতিয়ারের ভিতরে থাকবে।

২০১১ সালের অভিযুক্ত পাচারের ১৪৩ টি মামলা তদন্ত ও ৮০টি মামলা পরিচালনার তুলনায় ২০১২ সালে সরকারের প্রতিবেদনে ৬৭টি তদন্ত ও ১২৯টি মামলা পরিচালিত হয়েছে বলে উলেল্লখ করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে সরকার আট জন পাচারকারী অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, এবং কমপক্ষে পাঁচ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছে ডাব্লুসিএ'র বিধি ৫ ("নারী পাচার" নিষিদ্ধকরণ) এবং বিধি ৬(১) ("নারী শিশু পাচার" নিষিদ্ধকরণ) অনুযায়ী। যা ২০১১ সালের ১৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করার তুলনায় কম, যাদের আট জনকে যাবজ্জীবন দেয়া হয়েছিল।

কিছু বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানব পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগ মানব পাচার সমস্যাকে জটিল করেছে যা এখনো বর্তমান। বেশ কিছু এনজিও সংসদ সদস্য, দুর্নীতিগ্রস্ত নিয়োগকারী সংস্থা, এবং গ্রাম পর্যায়ের দালালদের মধ্যে যোগসূত্রের ব্যাপারটি উলেখ করেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, পুলিশ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেস ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দুই দিকেই চিহ্নিত করে মানব পাচারকারীদের ব্যবহৃত টোকেন যার মাধ্যমে সীমান্তে ধরা পড়লে গ্রেপ্তার এড়ানো যায়। এনজিও এবং গণমাধ্যম এর প্রতিবেদনে উলেখ রয়েছে যে ঢাকায় কিছু নিবন্ধিত নিয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রয়েছে যারা অভিবাসী শ্রমিকদের পাচারে বাধ্য করে এ সব নিয়োগকারী ও গন্তব্য দেশের দালাল যারা প্রতারণামূলক নিয়োগের ব্যবস্থা করে তাদের সাথে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডাব্লুসিএ'র বিধি ৫ অনুযায়ী পাচার সম্পর্কিত অভিযোগে তিনজন সরকারী কর্মকর্তার মামলা সরকার পরিচালনা করছে, যদিও সে সমস্ত মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি। সরকার পাচার-বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমীতে এবং গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ সহায়িকার মাধ্যমে। সরকারী সংস্থাগুলো এনজিও আয়োজিত আইন প্রয়োগ প্রশিক্ষণে সহায়তা করেছে, এবং সরকারী আইনজীবী এবং এসপিরা নাগরিক সমাজ কর্তৃক আয়োজিত আরো কিছু প্রশিক্ষণে 'এইচটিডিএসএ' পর্ব পরিচালনা করেন।

সুরক্ষা

যারা পাচার হয়েছিলো এমন ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য বিগত বছরে বাংলাদেশ সরকার সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সনাক্ত করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণসহ মানুষ পাচার বিষয়ে

তদন্তের মানসম্মত কার্যপ্রণালী বিষয়ে সরকার যদিও পুলিশের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু দুর্বল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা মানুষ পাচারের শিকার হতে পারে সরকারী কর্মকর্তারা তাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে সনাক্ত করেননি বা পাচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সুরক্ষা সেবা কেন্দ্রের যথোপযুক্ত সন্ধান দিতে সহায়তা করতে পারেননি। ২০১২ সালে মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে এমন ৬শ'র অধিক ব্যক্তি হয় নিজেরাই নিজেদের সনাক্ত করেছে অথবা সুশীল সমাজ গোষ্ঠীগুলো তাদের সনাক্ত করেছে। মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে এমন ব্যক্তিদের জন্য বা তাদের আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সরকার কোনো অর্থায়ন করেনি, তবে পাচারের শিকার হয়েছেন এমন মানুষরা আশ্রয়কেন্দ্র, ড্রপ-ইন সেন্টার, এবং নিরাপদ আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদান করা সেবা সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রকল্পগুলো সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিদেশে চাকুরি করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে এসেছেন এমন বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মীদের জন্য রিয়াদে বাংলাদেশী দূতাবাস যে আশ্রয়কেন্দ্রটি পরিচালনা করে থাকে সরকার সেটি পরিচালনা এখনো অব্যাহত রেখেছে। মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে এমন পুরুষদের ব্যাপারে সরকার সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সুরক্ষামূলক সেবা প্রদান করেনি। একজন ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন, যে সব দেশে এই সমস্যা সবচাইতে প্রকট সে সব দেশগুলোতে শ্রম পাচার সমস্যা মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক বাহিনীর যথেষ্ট লোকবলের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকেরা যখন শ্রম ও নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি লংঘন বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করে তাদেরকে বেশিরভাগ সময়েই 'বায়রা'র (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ) সালিশ-নিষ্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যা বেশির ভাগ সময়েই আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে না এবং খুব কম সময়ই বায়রা-অধিভুক্ত নিয়োগ এজেন্টদের বেআইনী কার্যক্রমের বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে তাদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে তদন্তকাজে ও বিচারের সময় অংশ নিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ উৎসাহিত করেছে কি না সে ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। একটি বেসরকারী সংস্থা জানিয়েছিল যে মানুষ পাচারের শিকার হয়েছিল এমন কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশে ফিরে আসার পর আটক হয়েছিল। তারা অন্য দেশে অভিবাসনের চেষ্টা করেছিল। অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যারা পাচারের শিকার হয়েছিল উপযুক্ত কাগজপত্রের অভাবে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক হয়েছিল। মানুষ পাচারের শিকার হয়ে এদেশে এসেছে এমন বিদেশীদের জন্য সরকার কোনো অস্থায়ী বা স্থায়ী বসবাসকারীর মর্যাদা প্রদান করেনি।

প্রতিরোধ

প্রতিবেদনকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকার পাচার প্রতিরোধে কিছু প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত বজায় রেখেছে যা বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে জোরপূর্বক কাজ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়। যেমন, আঞ্চলিক সহযোগিতার আবুধাবি সংলাপ কাঠামো অনুমোদন করেছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রমিকদেরকে তাদের অধিকার ও নিয়োগের সম্মানী সম্পর্কে অবহিত করা। তবে, এটি বায়রাকে অনুমোদন দিয়েছে অনেক উচ্চ এবং আইনত নিয়োগ সংক্রান্ত সম্মানী নির্ধারণ, স্বতন্ত্র সংস্থাকে অনুমতি প্রদান, বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদের সনদ প্রদান, বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের অভিযোগ নিয়ে কাজ করতে, অথচ এর ফলে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ঋণজনিত দাসত্বে পরিণত যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সরকারের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাব রয়েছে। সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় নাগরিক সমাজের সাথে একসাথে কাজ করছে সরকারী

কর্মকর্তা ও অরক্ষিত জনগণের মাঝে মানব পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে। "এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়েলফেয়ারস্ ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স" মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে; এর কাজ বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ উন্নয়ন। প্রতিবেদন সময়কালীন টাস্ক ফোর্স ৬৫টি নিয়োগকরী সংস্থাকে অনিবন্ধিত করেছে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের জন্য, তবে তা কী প্রতারণামূলক নিয়োগ না অনুমোদিত নিয়োগ সম্মানী আদায়ের জন্য তার কোন তথ্য নেই। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বায়রা'র মধ্যে বৈঠকের পর ২০১২ সালের ডিসেম্বরে "ঢাকা প্রিন্সিপল্স ফর মাইগ্রেশন উইথ ডিগনিটি" চালু করা হয়, যার মধ্যে এই নীতিটি অন্তর্ভুক্ত যে অভিবাসী শ্রমিকদেরকে কোন নিয়োগজনিত সম্মানী প্রদান করতে হবে না। এ ব্যাপারে একমাত্র প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় সরকারের মালয়েশিয়ার সাথে দুই সরকারের মধ্যে শ্রমিক নিয়োগ চুক্তি যেখানে সম্মানী নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ৫০০ ডলার; এ সত্ত্বেও মালয়েশিয়ায় শ্রমিকদের সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের সামর্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। স্বরাষ্ট্র সচিব আন্তঃমন্ত্রণালয় পাচার-বিরোধী কমিটি সভায় সভাপতি হিসেবে অব্যাহত আছেন, যা নিয়মিত বৈঠক করে, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাগরিক সমাজের সাথে দ্বিমাসিক পাচার-প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে কাজ করছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এখনো একটি চ্যালেঞ্জ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানব পাচারের উপর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োগের পূর্বে বাংলাদেশী সৈন্যদের মানব পাচার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ বছরে সরকার বাণিজ্যিক যৌনতা সংক্রান্ত কার্যক্রম হ্রাসের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ "২০০০ ইউএন টিআইপি প্রটোকল"-এর পার্টি নয়।

==========